বেকারত্ব , হতাশা আর বৈষম্যের প্রতি ক্ষোভের পুঞ্জীভূত বহিঃপ্রকাশের ফলে সৃষ্টি হয় কোটা সংস্কার আন্দোলন-২০১৮। তারই প্রেক্ষাপটে প্রবলভাবে ৮ই এপ্রিল প্রতিবাদের স্বরে আওয়াজ উঠে সারা দেশ জুড়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে । অপর দিকে সরকার মহল সেই বিষয়ে সঠিক সমাধানের পথ না খুঁজে, অন্যায়ভাবে প্রতিবাদ দমনের পথ বেছে নেয়। ছাত্রলীগের মাধ্যমে একাধিকবার হামলা, যৌন নিপীড়ণ আর পুলিশ বাহিনীর লাঠি চার্জ, গুলি বর্ষণ, মামলা, গ্রেপ্তার ইত্যাদির মাধ্যমে আন্দোলন দমানোর চেষ্টা করা হয়। অত্যচারের প্রতিবাদে আন্দোলন আরো জুড়ালো হয়। আন্দোলনের গতিবেগে দেখে- একটা সময় সরকার কৌশল অবলম্বন করে সকল কোটা তোলে নেওয়ার ঘোষনা দেয়। তাতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা আরো কিছু দাবির উপস্থাপনার মাধ্যমে আন্দোলন স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেয়। সময় গড়িয়ে ২০২৪ এসে সকারের কৌশল ধরা দেয় জাতির কাছে । আবারও নতুন রুপে শিক্ষর্থীদের আন্দোলন আর সরকারের পুরানো স্বৈরাচারী মানোভাব। এতে আন্দোলন হয়ে উঠে দাবানলের মত শক্তিশালী।

অবশেষে সরকার পতন!

নিম্নে ২০১৮ এবং ২০২৪ এর আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো-

শোষিত এক জাতি ১৯৭১ সালে বৈষ্যমের বিরুদ্ধে লড়াই করে যখন স্বাধীনতার সুখ পাওয়ার প্রত্যাশায়। ঠিক তখনই নতুন ভাবে দেখে বেকাররত্বর অভিশাপ। তার উপর মারার উপর খাড়ার ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে "কোটা"। তারই পরিপেক্তিতে বিভিন্ন সময় প্রতিবাদ জানানো হয়।

৩১ জানুয়ারী ,২০১৮ সরকারি চাকরিতে কোটা প্রথা বাতিল করে পুনঃমূল্যায়ন চেয়ে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের এক ছাত্র ও দুই সাংবাদিক রিট দায়ের করেন। ৫ই মার্চ ,২০১৮ সালে হাইকোর্টে রিটটি খরিজ করে দেয়। রিটের পর পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের "কোটা সংস্কার চাই(সকল চাকরির জন্য)" - নামক গ্রুপের মাধম্যে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং বিভিন্ন কর্মসূচির ডাক দেয়। পরবর্তীতে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে প্লাটফর্মটির নাম দেওয়া হয় "বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ"। তাদের ৫ দফা দাবির মধ্যে অন্যতম দাবি হলো কোটায় নিয়োগ ৫৬ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে নামিয়ে আনা, শূন্য পদে মেধাতালিকা থেকে নিয়োগ, সরকারি চাকরিতে সকলের জন্য অভিন্ন বয়সসীমা।

৮ এপ্রিল , ২০১৮ এর পূর্বের আন্দোলন দেশ ব্যাপী ব্যপকতা লাভ করে। শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন করে বিক্ষোভ করে। তদের সাথে যোগ দেয় শিক্ষক এবং দেশবরেণ্য লেখক। ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পাঠাগারের সম্মুখ থেকে "বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ" – বন্যারে হাজারো শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রার্থী বিশাল মিছিল নিয়ে শাহাবাগে অবস্থান নেয়। আন্দোলন রাত অবধি গড়ালে আকস্মিকভাবে শিশু পার্কের দিক থেকে ১০-২০ প্লাটুন দাঙ্গা পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এরপর আন্দোলন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় । আন্দোলনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ভেতওে পিছু হটে। মূহর্তেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস হয়ে উঠে রণক্ষেত্রে । সেদিকার ৯ টার পর কারফিউ আগ্রহ্য করে বিভিন্ন হল থেতে প্রতিবাদি মিছিল নিয়ে বের হলে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে জড়ো হয়। তারপর ক্যাম্পাসে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে ভিসির কাছে জবাবদিহিতা চায়।

রাত তখন ২.৩০ ঘটিকা, হঠাৎ নীলক্ষেত থেকে এক দল ছাত্রলীগ "জয় বাংলা" স্লোগানে ধেয়ে এসে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করে। তাদের হাতে ছিল লাঠিসোটা, চাপাতি প্রভৃতি অস্ত্র। শুরুতে আন্দোলনকারীদের উপর হামলা করলেও পরে উপচার্যের বাসভবনে অতর্কিত হামলা দেয়। রাতভর পুলিশ ও ছাত্রলীগ বহুলাংশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় ।

৯ এপ্রিল, গতরাতের ঘটনাবলি ছড়িয়ে পড়ে দেশ জুড়ে। প্রতিবাদে - "ক্যাম্পাসে হামলা কেন?/প্রশাসন জবাব চাই", "সন্ত্রাসীর কালো হাত/ ভেঙ্গে দাও, গুঁড়িয়ে দাও", বঙ্গবন্ধুর বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই" স্লোগানে শহরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী রাজু ভাস্কর্যের সামনে জড়ো হয়। পরে পুলিশের ধাওয়ায় দোয়েল চত্বরে অবস্থান করে। দুপুরের দিকে সরকার পক্ষের প্রস্তাবে ২০ জন ছাত্রের প্রতিনিধি গোল বৈঠক বসে সরকার পক্ষের সাথে। সরকার পক্ষ ৭ ই মে পযর্ন্ত সময়

চাইলে তা নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থীরা আন্দোলন স্থগিতের ঘোষনা দেয়। এতে করে আন্দোলনরত এক দল শিক্ষার্থী সেই প্রস্তান প্রত্যাক্ষান করে। তাই রাজ পথে থাকা আন্দোলন কারীদের মধ্যে নেতৃত্বের সংকট সৃষ্টি হয়। তাই জ্যেষ্ট শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে আন্দোলন বন্ধ করে ,আগামীদিনের কর্মসূচি দেয়।

১০ এপ্রিল, আগের দিন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর বিতর্কিত এক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আন্দোলন অন্য দিকে মোড় নেয়। এতে করে বেসরকারি বিশ্ব বিদ্যালয়গুলোও রাজপথে নেমে আসে । অপর দিকে "বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ" এর নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থীরাও আবার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষনা দেয়। তাতে করে আন্দোলন দাবানলেন মতো বিশাল হতে থাকে। রাত আটটা পর্যন্ত চলে আন্দোলন। তার মাঝে রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের হল ইউনেটের সভাপতি ইফফাত জাহান এশা আন্দোলন করা ছাত্রীদের উপর হামলার করে এবং ঘটনাস্থলে একজন আন্দোলন করা শিক্ষার্ত্রীর পায়ের রগ ছিন্ন হয়ে যায়।

১১ এপ্রিল, রাত শেষে সকাল হতে না হতেই বিশাল মিছিল নিয়ে বের হয় এবং রাজু ভাস্কর্যে জমায়েত হয়। তবে আন্দোলন খুব তীব্র হওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রী কৌশলে সংসদে - কোটা থাকলে তা বার বার সংস্কার করতে হবে, তাই সম্পূর্ণ কোটা বাতিল বলে ঘোষনা দেন। সেই কৌশলে পা দিয়ে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন স্থগিত করে।

১২ ই এপ্রিল , "বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ" এর ব্যানার সংবাদ সম্মেলন করে প্রধানমন্ত্রীকে তার ঘোষনার জন্য অভিনন্দন জানানো হয়।

তবে শিক্ষার্থীরা ঘরে ফিরে গেলেও ১৬ এপ্রিল পরিষদের তিন নেতাকে– যুগ্ম আহ্বায়ক নূরুল হক নূর, ফারুক আহমদ ও রাসেদ খানকে -সাদা পোশাকধারী ব্যক্তিরা তুলে নিয়ে যায়। পরে আবার শিক্ষার্ত্রীরা আন্দোলন শুরু করলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর সরকার টালবাহানা শুরু করে প্রজ্ঞাপন জারির নিয়ে। একেরপর এক তারিখ পরিবর্তন করতে থাকে । তাই ১৪ মে সারাদেশে ধর্মঘাট ডাকা হয়। তবে সেশনজট এবং রমজান মাস বিবেচনা করে ১৯ শে ক্লাস বর্জন অব্যহত রেখে পরীক্ষা বর্জন স্থগিত কারার সিদ্ধান্ত নেয় আন্দোলন করা শিক্ষার্থীরা । এভাবে আড়াই মাস কেটে গেলেও সরকারের দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি দেখা যায় নাই। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ জুন পরিষদ কেন্দ্রীয় লাইব্রারির সামনে একটি সংবাদ সম্মেলন ডাক দেয়। কিন্তু সে সম্মেলন শুরুর পূর্বেই ছাত্রলীগ তা পন্ড করে দেয়।

এভাবে নানান আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থী এবং অংশগ্রহণকরা বিপ্লবী শিক্ষার্থীদের উপর হামলা, হুমকি , মামলা, গ্রেফতার চলমান ছিল পরবর্তী কয়েক মাস জুড়ে। তবে ন্যায়ের পক্ষের শিক্ষার্থীরা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে বার বার আন্দোলন করে গেছে।

অবশেষে সরকার ২০১৮ সালেন ৪ অক্টোবর প্রজ্ঞাপন জারি করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারি প্রজ্ঞাপনে বলা হয় -

"সরকার সকল সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের চাকুরিতে সরাসরি নিযয়োগের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৭/০৩/১৯৯৭ তারিখের সম(বিধি-১) এস-৮/৯৫(অংশ-২)-৫৬(৫০০) নং স্মারকে উল্লিখিত কোটা পদ্ধতি নিম্নরূপভাবে সংশোধন করিল:-

(ক) ৯ম গ্রেড (পূর্বতন ১ম শ্রেণি) এবং ১০ম-১৩তম গ্রেডের (পূর্বতন ২য় শ্রেণি) পদে সরাসরি নিযয়োগের ক্ষেত্রে মেধার ভিত্তিতে নিযয়োগ প্রদান করা হইবে; এবং

(খ) ৯ম গ্রেড (পূর্বতন ১ম শ্রেণি) এবং ১০ম-১৩তম গ্রেডের (পূর্বতন ২য় শ্রেণি) পদে সরাসরি নিযয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোটা পদ্ধতি বাতিল করা হইল।"

তারপর কিছু সংযোজন বিয়োজন হলেও ২০২১ সালে পতিপত্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে অহিদুল ইসলাম সহ ৭জন মুক্তি যোদ্ধার সন্তান হাই কোর্টে রিট আবেদন করে। ২০২৪ সালের ৫ জুন বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের ও বিচার পতি খিজির হায়াতের হাই কোর্ট বেঞ্চ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের পক্ষে রায় দেয় এবং কোটা পুনরায় বহাল করে। শুরু হয় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বড় আন্দোলনের সূত্রপাত।

৬ জুন, ২০২৪ হাইকোটের রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা । এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরো ৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন কর্মসূচি পালন করে । তারা কোটা পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত বাতিল না হলে তীব্র আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেয়।

৯ জুন,২০২৪ সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা পুর্নবহালের প্রতিবাদে আবারও বিক্ষোভ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা । তাছাড়া চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন কর্মসূচি পালন করে। " ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীবৃন্দ" ব্যানারে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি দল সুপ্রিম কোর্টে অ্যাটার্নি জেনারেল বরাবর স্মারকলিপি দিতে যায়। শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি মানতে সরকারকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয় এবং ঈদুল আযহার কারণে বিরতি ঘোষনা করা হয়।

১ জুলাই, বেশ কিছু দিন অপেক্ষার পর কোনো সমাধান না পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় , রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সহ আরো কিছু বিশ্ববিদ্যালয় রাজ পথে নামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তিন দিনের কর্মসূচি এবং ৪ জুলাইয়ের মধ্যে দাবির চূড়ান্ত সুরাহার আহ্বান জানায়।

২ জুলাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগরের সামানে থেকে মিছিল বের করে শাহবাগে অবস্থান করে। সেখানে তারা ১ ঘন্টা কর্মসূচি পালন করে। অপরদিকে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ২০ মিনিটের জন্য ঢাকা-অরিচা রোড অবরোধ করে।

৩ জুলাই থেকে ৬ জুলাই , বরাবরের মত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গুলো বিক্ষোভ মিছিল, রাস্তা অবরোধ করে। এ সময় বিভিন্ন কলেজগুলো আন্দোলনে নামা শুরু করে । তাছাড়া ৬ জুলাই নতুন কর্মসূচির ডাক দেয় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। এর নাম দেওয়া হয় "বাংলা ব্লকেড"

৭ জুলাই , বাংলা ব্লকেডে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় রাজধানীসহ বেশ কিছু মহাসড়ক। অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষনা দেওয়া হয়।

৮ জুলাই, কোটা বৈষম্যের বিরুদ্ধে ও স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে "বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন" নামে ৬৫ সদস্যের সমন্বয়ক টিম গঠন করা হয়। ঢাকায় বিভিন্ন জায়গায় অবোরোধ করা হয়। এছাড়াও ৩ টি রেলপথ এবং ৬টি মহা সড়ক অবরোধ করা হয়।

৯ ই জুলাই , এই দিন আগের দিনের মতোই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হয়। সাথে পরের দিন সকাল-সন্ধ্য "বাংলা ব্লকেড" কর্মসূচি পালনের ঘোষনা দেওয়া হয়।

১০ জুলাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শাগবাগে জড়ো হয়ে অবরোধ করে। দুপুরে আপিল বিভাগ কোটাব্যবস্থা বাতিল করে হাইকোর্টের দেয়া রায়ের চার সপ্তাহ স্থিতাবস্থা দেওয়া হয়েছে বলে ঘোষনা দেয়। প্রধান বিচারপতি শিক্ষার্থীদের ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করেন।

১১ জুলাই, পুলিশি বাধা আর বৃষ্টির কারণে শাহবাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন করে ৪:৩০ ঘটিকায়। চট্টাগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা পুলিশি বাধা অতিক্রম করে আন্দোলন করলেও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষর্থীরা পুলিশের হামলার শিকার হয়।

১২ জুলাই, পুলিশি হামলার প্রতিবাদে এবং কোটা সংস্কারের দাবিতে শুক্রবার ছুটির দিনও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিক্ষোভ মিছিল করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রেল পথ আবরোধ করে।

১৩ জুলাই, রাজশাহীতে গতকালের মতো রেলপথ অবরোধ করে আন্দোলন করে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অভিযোগ আনে -" মামলা দিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে বাধার চেষ্টা করা হচ্ছে। "

১৪ জুলাই, পদযাত্রা কর্মসূচির মধ্যে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দেয়। এদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন-'মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-পুতিরা পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতি-পুতিরা চাকরি পাবে?' এই নিয়ে রাত ১০ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালের বিভিন্ন হল থেকে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল করে রাজু ভাস্কর্যে জড়ো হয়। তখন আন্দোলন করা শিক্ষার্থীরা 'চেয়েছিলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার'সহ নানা ধরনের স্লে-াগান দেয়। তাতে রাতে সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ৪-জি নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দিতে অপারেটরদের নির্দেশনা দেয়।

১৫ জুলাই, দুপুর ২ টায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের গতরাতে "রাজাকার" স্লোগানের জবাব ছাত্রলীগ দিবে বলে উস্কানীমূলক বক্তব্য দেন রাজধানীর ধানমন্ডী এক প্রোগ্রামে।

বেলা ৩ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ হামলা চালায় আন্দোলনকারীদের উপর। এতে করে দুই পক্ষে দফায় দফায় হামলা চলে। দেশের বিভিন্ন জেলায় ছাত্রলীগের এমন হামলা চলে। শুধু ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসা নেয় ২৯৭ জন আহত শিক্ষার্থী।

১৬ জুলাই, রাত সোয়া ২ টার দিকে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যায়ের উপচার্যের বাস ভবনের সামনে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর হামলা চালায়। এইদিন সকালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আন্দোলনের ব্যপকতা বাড়তে থাকে। দিনভর চলে বিক্ষোভ আর সংর্ঘষ। রংপুরে আন্দোনকারী বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে নিহত হন। তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং গণ মাধ্যেমে ছড়িয়ে গেলে আন্দোলন বিস্ফুরণের মতো গতি পায়। পরের দিন নিহত ৬ জনের স্মরণে গায়েবানা জানাজা ও কফিন মিছিল এ কর্মসূচি ঘোষনা করা হয়।

১৭ জুলাই, ছুটির দিনেও আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা তাদের কর্মসূচি পালন করে যায়। তবে পুলিশি বাধার কারণে শিক্ষার্থীদের কাফিন মিছিল পন্ড হয়ে যায়। এতে পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংর্ঘষের ঘটনা গঠে। তার মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন হল বন্ধের ঘোষনা দিলে অনেক শিক্ষার্থী হল ছেড়ে চলে যায়।

১৮ জুলাই , রাজধানীসহ আরো ৪৭ জেলায় সারা দিনব্যপি বিক্ষোভ, অবরোধ, পাল্টাপাল্টি ধাওয়া , পুলিশের হামলা-গুলি ও সংঘাতের ঘটনা ঘটে। এতে আহত সংখ্যা ১৫০০ এবং ২৭ জন নিহত হয় । পুলিশ দ্বারা আন্দোলন সামাল দিতে না পেরে সারা দেশে বিজিবি মোতায়েন করা হয়। ইন্টারনেট সেবা বন্ধ রাখা হয়।

১৯ জুলাই, এদিন পালিত হয় "কমপ্লিট শাটডাউন"। এই কর্মসূচি ঘিরে সংঘর্ষ, হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। আন্দোলনের ভয়াবহ শুধু ঢাকায় নয় , সারা বাংলাদেশ ন্যায়ের পক্ষে সচ্চার হয়ে উঠে। নরসিংদী কারাগারে ভাংচুর করে আগুন লাগিয়ে ২ হাজার কয়েদি বের করে এবং বিআরটিএ ভবনে আগুন দেয়। মধ্যরাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামকে আটক করা হয়। এছাড়া গণঅধিকার পরিষেদের সভাপতি নুরল হক নুরকেও আটক করা হয়। এদিন সারাদেশে ৭৫ জন নিহত হয়।

২০ জুলাই, ইন্টারনেট বিহীন তৃতীয় দিন। দেশজুড়ে সেনাবাহিনীর কারফিউ । সংঘর্ষে নিহত হয় ২৬ জন। মেট্রো স্টেশনে ভাঙচুর। এইদিন 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের' অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ করেন অন্য সমন্বয়করা।

২১ জুলাই, প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন সাত সদস্যের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে সরকারি চাকরিতে মেধার ভিত্তিতে ৯৩ শতাংশ নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা । বিটিভি ভবনে আগুন, সেতু ভবনে ভাঙচুর, দেশের বিভিন্ন জায়গায় অগ্নি সংযোগ করা হয় । চতুর্থ দিনের মত ইন্টারনেটবিহীন সারাদেশ। কারপিউ জারি ছিল। । নিহত সংখ্যা ১৯ জন।

২২ জুলাই , আদালতরের নির্দেশ অনুযায়ী তৈরি প্রজ্ঞাপন অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী। ৫ম দিনের মত ইন্টারনেট বিহীন ছিল বাংলাদেশ। চার দফা দাবি জানিয়ে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দেয় সমন্বয়ক নাহিদ। নিহতের সংখ্যা ৫ জন।

২৩ জুলাই, অবশেষে কোটা সংস্কার প্রজ্ঞাপন জারি হলেও আন্দোলন তখন শুধু কোটা আন্দোলনে সীমাবদ্ধ ছিল না। নিহতের সংখ্যা ২ জন। তবে সময় গড়ালে আগের দিন গুলোর নিহত এবং আহতের সংখ্যা বাড়তে ছিল। রাতে অল্প পরিসরে ব্রডব্যান্ড সেবা চালু।

২৪ জুলাই, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ, আবু বাকের মজুমদার ও রিফাত রশীদের খোঁজ পাওয়া যায়।

২৫ জুলাই ব্রডব্যান্ডে ধীরগতিতে ইন্টারনেট পাওয়া যায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। সম্বনয়ক থেকে আটটি বার্তা দেওয়া হয় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদেও উদ্দেশ্যে।

২৬ জুলাই, সরকার পক্ষ সারাদেশে এলাকা করে চালায়" ব্লক রেইড"। মোট ৫৫৫ টি মামলায় শিক্ষার্থীসহ ৬২৬৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এই পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ২০৯ জন। নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ ও আবু বকর মজুমদারকে সাদা পোশাকদারী গোয়ান্দা সংস্থার লোকেরা ধরে নিয়ে যায়।

২৭ জুলাই, কোটা সংস্কার আন্দোলনের আরো ২ জন সমন্বয়বে ডিবি হেফাজতে নেওয়া হয়। তাঁরা হলেন সারজিস আলম ও হাসনাত আবদুল্লাহ। এদিনও কারফিউ চলমান ছিল। এদিন পর্যন্ত মোট ১১ দিনে ৯১২১ জন গ্রেফতার হয়। সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২১০ জন।

২৮ জুলাই ,সমন্বয়ক নুসরাত তাবাসসুমকে হেফাজতে নিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। ডিবি হেফাজতে সমন্বয়কদের মাধ্যমে জোর পূর্বক ভিডিও ভার্তার কর্মসূটির প্রত্যাহারের ঘোষনা দেওয়ায়। 'সমন্বয়কদের কাছ থেকে জোর করে আন্দোলন প্রত্যাহারের বিবৃতি আদায়, সারা দেশে বিনা বিচারে হত্যা, গুম-খুন, মিথ্যা মামলা ও গণগ্রেপ্তারের প্রতিবাদে' - বাহিরে থাকা সমন্বয়করা বিক্ষোভ কর্মসূচি দেয়। মোবাইল ইন্টারনেট ১০ দিন পর সচল করা হয়।

২৯ জুলাই, আবার নতুন উদ্দিপনা নিয়ে রাজপথে সক্রিয় ভাবে নামা শুরু করে শিক্ষার্থীরা। জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধের সিদ্ধান্তে ১৪ দলের বৈঠক বসে। তখনও ৬ জন সমন্বয়ক ডিভি হেফাজতে আটক। ৩০ জুলাই সরকার ঘোষিত শোক দিবসকে প্রত্যাখ্যান করে শোকের কালো রং বাদ দিয়ে আন্দোলনকারী এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিবর্গ, সাধারণ নাগরিক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের একটি বড় অংশ এমনকি সাবেক সেনাপ্রধানও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লাল প্রোফাইল ছবির মাধ্যমে কোটা আন্দোলনকারীদের সাথে সমর্থন জানান।

৩০ জুলাই , শিক্ষক , সংস্কৃতিকর্মী, সাংবাদিক, লেখক, শিক্ষার্থীসহ নানা শ্রেণি পেশার মানুষ হত্যার বিচার চেয়ে মুখে লাল কাপড় বেঁধে মিছিল করে। ফেসবুকের প্রোফাইল জুড়ে লাল রঙে চেয়ে গেছে। শুধু সরকার সমর্থকদের ফেসবুক প্রোফাইল কালো রঙেন ফ্রেম জুড়েছিল। তাছাড়া এই দিন ৯ দাবি আদায়ের লক্ষ্যে "মার্চ ফর জাস্টিস" কর্মসূচির পালনের ঘোষনা দেওয়া হয়।

৩১ জুলাই , সারা দেশ জুড়ে "মার্চ ফর জাস্টিস" কর্মসূচি পালন করা হয় । বিগত দিনের হত্যা, মামলা, হামলা, গ্রেফতার ও গুমের প্রতিবাদ জানানো হয়।

০১ আগষ্ট বা ৩২ জুলাই ডিবি হেফাজতে থাকা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়দের ছেড়ে দেওয়া হয়। বিকালে এক প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরকে নিষিদ্ধ করে সরকার। তাছাড়া এইদিনে 'রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোজ' কর্মসূচি পালন করা হয়।

০২ আগষ্ট সমন্বয়করা বের হওয়ার পর আন্দোলন হয়ে উঠে আরো জাগ্রত। সারা ব্যাপি দৃশ্যমান আন্দোলন গড়ে উঠে। আন্দোলন শুধু শিক্ষার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে সাধারণ মানুষও মুক্তির স্বাদ নিতে রাজ পথে নামে । পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ ও আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করে। তবে আন্দোলন হয়ে উঠে দুর্বার। উল্টো আরো নতুন কর্মসূচি দেওয়া হয়। রাতে গণভবনে জরুরি বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রী সমন্বয়কদের সাথে আলোচনা করার নির্দেশ দেয়।

৩ আগস্ট কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম জানান সরকারের সাঙ্গে আলোচনার কোনো পরিকল্পনা নাই তাদের। এইদিন সারাদোশে ব্যপকভাবে আন্দোলন । তার মাঝে বিকালে এন বিশাল জনশ্রোত জমা হয় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনরে। সেদিন সেখানে দেশ বরণ্য বিভিন্ন শিল্পি সহ সকল পেশার মনুষের সমাগম হয়। জনশ্রোত ভেসে উঠে , "এক দফা, এক দাবি"

৪ আগস্ট , এক দফা দাবীতে সারা দেশ উত্তাল হয়ে উঠে। বিভিন্ন জায়গায় ভাঙচুর ,অগ্নিসংযোগ দেওয়া হয়। এর মঝে ৬ তারিখের ঢাকা টু লংমার্চ ৫ তারিখই করার ঘোষনা দেয়। এতে কারে আওয়ামীলীগের অনেক নেতাকর্মী বিদেশ পাড়ি দেয়। ঢাকার আসে পাশে বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ ঐদিন রওনা দেয়। দিশেহারা সরকার তখন কারফিউ চালু করে। ঢাকামুখী রাতের রাজপথ হয়ে উঠে মানুষের পথ যাত্রায় পরিপূর্ণ।

৫ আগস্ট লক্ষ লক্ষ মুক্তিকামী মানুষ কারফিউ ভেঙ্গে অত্যাচার ,শোষন, শহিদের রক্তের মূল্য দিতে ঢাকায় একত্রিত হয়। একটাই লক্ষ্য সবার সৈরাচারের পতন! তাই গণভবনের দিকে সবাই যাত্রা শুরু করো। এর মাঝে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ করে দেওয়া হয়। ৩ ঘন্টা পর সবকিছু খোলে দেওয়া হয়। ততে সবাই পায় গণভবনে যাওয়ার আগেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর তার ছোট বোন শেখ রেহেনা সেনাবাহিনীর প্রধানের সহযোগীতায় দেশ ছাড়েন ভারতের উদ্দেশ্যে। এভাবেই একটি ছাত্র আন্দোলন সফল হয় এবং জাতি পায় পুনরায় বিজয়ের স্বাদ।